চিঠি

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

আজই সকালে যে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, এমন দিনটি যে নির্দিষ্ট ছিল এমন এক আশ্চর্য কাজের জন্য—তা যখন ঘুম ভেঙে উঠেচি তখনো জানি কি?

আজই বিশেষ করে বলচি এজন্যে যে, আজ আমাদের দিল্লি যাওয়ার দিনটি নির্দিষ্ট ছিল। দিল্লিতে জওহরলালজী পৌরোহিত্য করবেন আমাদের এক সভায়।

সমস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লির মহাসম্মেলনে, আমিও সেখানে যাবো, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি, সবাই মিলেমিশে একত্র যাবো। মনে খুব উৎসাহ এবং দীপ্ত আনন্দ।

এক বন্ধুর চিঠি কাল পেয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে যাবেন সস্ত্রীক; আমি যেন কলকাতায় গিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

গ্রামেই থাকি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমার প্রয়োজন হয় পল্লী-প্রকৃতির পরিবেশ, ছায়াভরা লতাবিতান। সেখান থেকে ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র দিল্লিতে যাবো। পথে পড়বে কাশী এলাহাবাদ কানপুর— ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত সুপ্রসিদ্ধ কর্মভূমি। ঐতিহাসিক দিগন্তের কত বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল এদের পুণ্যভূমিতে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বনে বনে নাটা-কাঁটার ফুলের শিষ উঁচু হয়ে আছে, ভুরভুর করছে সুবাস শরতের বাতাসে। এবার বর্ষা বেশি। রোজ লেগেই আছে বৃষ্টি। রাস্তাঘাটের কাদা শুকুতে চায় না।

ভাবছি এখানে প্রত্যাসন্ন শরতের অপূর্ব শ্যাম শোভা ছেড়ে দিল্লির ঊষর রুক্ষ প্রান্তরে যাবো বটে, কিন্তু কি পাবো সেখানে? জওহরলালের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হবে; রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক টেবিলে চা-পানের সৌভাগ্য হয়তো হয়ে যাবে। মনে মনে যে এসব নেই সে কথা অস্বীকার করলে মিথ্যে কথা বলা হবে।

হরিপদ বাঁড়ুজ্যে এসে বললে— ভায়া, দিল্লি যাচ্ছ নাকি শুনচি?

—যাবো ভাবছি।

—কবে যাবে?

—কাল সকালে।

—তারা খরচপত্র দেবে তো?

—না, তারা কেন দেবে?

—বলো কি, সব খরচ তোমাদের করতে হবে? নইলে ভাবছিলাম তোমাদের রিজার্ভ গাড়িতে না হয় যাবো তোমাদের সঙ্গে। ভাড়াটা লাগতো না।

—রিজার্ভ গাড়িতে গেলেও ভাড়া লাগে দাদা।

হরিপদ বাঁড়ুজ্যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললে— কেন? ভাড়া তো তোমাদের জমা দেওয়াই আছে।

—আছে তো বটেই, কিন্তু যারা সে ভাড়াটা দিয়েছে তারাই যাবে সে গাড়িতে তোমাদের নেবে কেন?

—তুমি যদি নেও?

—ভাড়া দিতেই হবে। বিনা ভাড়ায় যাওয়া চলে না।

—তবে আর রিজার্ভ মানে কি হল!

হরিপদ বাঁড়ুজ্যে অপ্রসন্ন মুখে তামাক খেতে লাগলেন। রিজার্ভ গাড়ি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটু অদ্ভুত রকমের সন্দেহ নেই। ভাবছি যে ওঁর ভ্রান্ত ধারণার একটু সংশোধন করে দেওয়া দরকার।

এমন সময় গফুর পিয়ন এসে বললে- বাঁড়ুজ্যে মশাই বাড়ি আছেন?

গফুর পিয়ন বড় ভালো লোক। আমাদের এখানে গফুর অনেকদিন আছে, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা ওর। বাড়িতে ডেকে ওকে জলখাবার খাওয়ায়। কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, আমের সময় আম, তালের বড়ার সময় ঝোলা গুড় আর তালের বড়া। বললাম—গফুর কি পাকিস্তানে চলে যাবে?

—হ্যাঁ বাবু, আমাকে যশোরে বদলি করেচে।

—সত্যি গফুর, তুমি পাকিস্তানে গেলে আমাদের সকলেরই মনে বড় দুঃখ হবে।

গফুর বিনীত হাস্যে বললে— বাবু, আমারও মনডা কি ভালো থাকবে? আপনাদের এখানে যে রকম কাটিয়ে গেলাম, এমন সোনার চোখে আমাকে অপর জায়গায় কি দেখবে?

—সকলেই দেখবে। যে ভালো হয় তাকে সকলেই ভালো বলে, বুঝলে না গফুর?

গফুর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললে— বাবুর আজ মোটে একখানা। গফুর চিঠি দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, আমি বললাম—যাবার আগে একটু দেখা করে জল মুখে দিয়ে যেয়ো। সামান্য একটু মিষ্টিমুখ—

গফুর হেসে চলে গেল।

তারপর চিঠিখানার দিকে চেয়ে বিস্মিত হলাম। কাঁচা মেয়েলি হাতে লেখায় চিঠিখানা লেখা— পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণকমলেষু—

কে চিঠি লিখেছে? খামখানা এত ময়লা আর পুরনো আর অন্য রকমের! এ আবার কি রকমের খাম— আজকালকার খামের মতো নয়!

কোনো ভক্ত পাঠিকার চিঠি নাকি? খুলেই ফেলা যাক।

আশ্চর্য, এ কার চিঠি!

চিঠিখানা এই : —

শ্রীচরণকমলেষু,

শ্রীচরণের দাসিকে কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? অনেকদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই। আমরা কি অপরাধ করিয়াছি কি জানি। আপনি খড়িবেড়েতে নারাণ মুখুজ্যের ভাইপোর বিয়েতে বরযাত্রি আসিয়াছিলেন ভরত দাদার মুখে শুনিলাম। কিন্তু এ দাসীকে দর্শন দিতে আসিলেন না কেন, ইহার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আপনি রাগ করিলে দাসীর আর কে আছে বলুন? সেই ফুলশয্যার রাতের দিন আমাকে আম খাওয়ানোর জন্যে আপনার কি জেদ। আমি আম খাইনি কেন জানেন, তাহা বলিব। বিয়ের দরুন ভালো চেলি পরনে ছিল জানো গো মশাই। তাই যদি নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য আম খাইনি। অমনি মশায়ের রাগ হল, কি রাগ সারা রাত্তির। জানো এখন আমার সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। না, এসব লিখিব না তুমি আবার রাগ করিবে। এতদিন এখানে আসিলে না কেন? আমার ওপর রাগ করিও না। তুমি এমন নির্দয়, আমার ওপর মায়া হইল না। যাই হউক, তোমার ওপর জোর আছে বলিয়া তাই তোমাকে বার বার জ্বালাতন করিতেছি। মা ও পিসিমা কত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন একবার আসিয়া তাঁহাদের চিন্তা দূর করিবেন। ভাবিয়া দেখুন কতদিন আপনাকে দেখি নাই, না দেখিয়া আমার মনটার মধ্যে কি রকম হইতেছে। তুমি সেই গান গাহিয়াছিলে, বিভাদিদি গান গাহিয়াছিল, সেই সব কথা মনে পড়ে আর বুক যেন ফাটিয়া যায়। ওগো তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না একবার শ্রীচরণ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। ওগো, তুমি এবার আসিলে আমি কত গান শুনাবো বিভাদিদির কাছে ও কর কাকাদের বাড়ির সেজ-বৌয়ের কাছে কত গান শিখিয়াছি। শুনবে তো? এসেছে হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে। সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা তরণি বেয়ে চলো নাহি বেলা। সুখ যদি না পাও যাও সুখেরি সন্ধানে। কিছু নাহি চাবো গো আমি তোমার বিহনে। তোমাতে করিব বাস দীরঘ দিবস মাস। এই সব গান শিখিয়াছি। তুমি এলে চিলের কোঠায় দুপুরে দু'জনে বসিয়া গাহিয়া শুনাবো। রাণি দিদি ঠাট্টা করে

বলিয়া আমার গান গাহিতে লজ্জা করে। যাহোক, এবার ঠিক গান গাহিয়া শোনাবো। আমায় আর কষ্ট দিয়ো না, ওগো অত নির্দয় হয়ে দাসিরে চরণে ঠেলিও না। আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমার শ্রীচরণের দাসী—

নিরুপমা

তাং ২২ ফাল্গুন, ১৩২৪ সন।

কুলবেড়িয়া। জেলা নদীয়া।

ভালো বুঝতে পারলাম না। বানান ভুল, ভাষা ভুল, ছেদচিহ্নহীন এ চিঠিখানা কার? নিরুপমা? কে নিরুপমা?

পত্রখানি মনে এক অপূর্ব ভাব এনে দিল। কতদিন আগেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের সুবাসভরা দিনগুলির বাতাসে মেশানো ছিল যে পিককুলের রসিকতা, নব বসন্তের পত্রশোভা, দায়িত্বহীন জীবনের নিশ্চিত আরাম, মোহমদির দিগন্ত, অপরূপ মাধুরী এতকাল পরে আবার ফিরিয়ে আনল চিঠিখানা।

তবুও বুঝতে পারলাম না কার এ চিঠি? গত ২৪ সালের চিঠি এল ৫৪ সালের ভাদ্র মাসে। আচ্ছা এও কি সম্ভব? আমার এতকাল আগেকার পরলোকগত স্ত্রী নিরুপমার চিঠি এল আজ ত্রিশ বছর পরে?

এতকাল এ চিঠি কোথায় ছিল? কোন্ ডাকঘরের কোন্ আলমারির অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করে ছিল সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর? আমার ফুলশয্যার পরে নবপরিণীতা বধূর করুণ আহ্বান-লিপিখানি ডাকঘরের কর্মচারীরা এতকাল লুকিয়ে রেখে কি রসিকতা করতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে?

এই চিঠি আসছিল গত ত্রিশ বছর ধরে। কত ঘটনা ঘটে গেল এই ত্রিশ বছরে, আমার জীবনের কত উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। কত শোক, দুঃখ প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে এই চিঠিখানা আসছিল।

ত্রিশ বছর পরে এ চিঠি পেয়ে লাভ কি আমার?

চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলপুকুর গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ির চিলেকোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে। চতুর্দশ-বর্ষীয়া দেশে অবস্থিতা সেই সুন্দরী বধূটির মুখ এতকাল একেবারেই মনে ছিল না— আজ হঠাৎ অতি আশ্চর্যরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকে বললে— পিয়ন এল দেখলাম, কার চিঠি এল গো? অমন করে বসে আছ কেন?

চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিয়ে বলি— পিয়ন? কই চিঠি কিছু আসেনি। ও সই দিতে নিয়ে এসেছিল।

নিরুপমা মারা গিয়েছে আজ কত বছর? আটাশ-ঊনত্রিশ বছর খুব হবে। বিয়ের পর কতদিন বেঁচে ছিল বা? বছরখানেক কি দেড় বছর হবে।